নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রে জব অপরচুনিটি

ওপি ওয়ানের পর ডিভি লটারিতে বহু বাংলাদেশী পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রান্ট হয়েছেন। অনেকে আবার এককভাবে এসেছেন। এদের অনেকেই এখন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। তাদের মধ্যে অনেক পরিবারই এখন সুপ্রতিষ্ঠিত বা লব্ধ প্রতিষ্ঠিত। বাকিরা হয়তো এখনো একটি সুন্দর জীবনের জন্য সংগ্রাম করছেন। অচিরেই তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন।

আমার লেখার বিষয় অবশ্যই তাদের নিয়ে নয়। তবে যারা এ দেশে এসেছেন তাদের কাছ থেকে নেয়া এবং নিজের সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে এ লেখা লিখছি।

যুক্তরাষ্ট্রে এসে একজন ইমিগ্রান্টের সবচাইতে যে জিনিসটির প্রয়োজন হয় তাহলো একটি চাকরি বা কাজ। কারণ এখানে একা অথবা পরিবার নিয়ে যেভাবেই আসি না কেন, অন্তত সাধারণ একটি চাকরি বা কাজ ছাড়া চলাফেরা একেবারেই অসম্ভব। আর এই চাকরি বা কাজটা অবলম্বন করেই সামনের দিকে এগুতে হয়। এখানে কাজ আছে বিভিন্ন রকমের। প্রচুর অডজব আছে, যা কি না প্রথমে প্রায় সব ইমিগ্রান্টই করে। এরপর আস্তে আস্তে যে যার পেশায় চলে যায়।

তবে যে যে পেশায় থাক না কেন, তাকে ইংরেজি বলতে, লিখতে এবং পড়তে জানতে হবে। যে যত বেশি জানবে, তার তত বেশি লাভ বা উপকার হবে। রাস্তায় চলাফেরা থেকে শুরু করে কেনাকাটা, স্কুল-কলেজে যোগাযোগ অথবা চাকরি বা কাজের জন্য ইংরেজি জানা এবং বলতে পারা খুবই জরুরি।

আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আমাদের দেশের ইমিগ্রান্টরা ভালো ইংরেজি জানে। তবে আমরা খুবই 'লাজুক' প্রকৃতির। ফলে কতখানি জানি তা বলতে চাই না বা বলতে পারি না। কিন্তু অনেককে দেখেছি অল্প কিছুদিনের মধ্যে এ জড়তা কাটিয়ে ওঠে। 'লাজুক' ভাবটি চলে যায় ধীরে ধীরে। আমি নিউইয়র্কে থাকি। সুতরাং নিউইয়র্কের কথাই বলছি। এখানে বহু চেইন স্টোর, ওষুধের দোকান বা ফার্মেসিতে, ফাস্টফুডের দোকানে বাঙালি নারী-পুরুষ কাজ করছে স্টোর ম্যানেজার হিসেবে। সুতরাং চাকরি বা জব পাবার ক্ষেত্রে এটিও একটি প্লাস পয়েন্ট। প্রত্যেক ইমিগ্রান্টেরই দেশ থেকে আসার সময় তার স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেটগুলো অবশ্যই ইংরেজিতে অনুবাদ বা ইংরেজি ভার্সন করে আনতে হবে। যারা এখানে উচ্চ শিক্ষা করতে চান বা নিজ নিজ পেশায় ফিরতে চান সে ক্ষেত্রেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও হাইস্কুলের সার্টিফিকেটের ইংরেজি ভার্সন থাকতে হবে। এখানে এটির 'ইভালুয়েট' করার ব্যবস্থা আছে এবং ইভালুয়েশনের পর শিক্ষকতা, নার্সিং এবং অন্যান্য পেশায় যেতে পারেন। তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় 'প্রশিক্ষণ' নিতে হবে বা ক্লাস করতে হবে। বর্তমানে অনেক বাংলাদেশী মহিলা এবং পুরুষ নার্সিং, স্কুলের খন্ডকালীন শিক্ষকতা, স্কুলে শিক্ষকতা, ব্যাংক, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও পাতাল রেলের টিকিট ক্লার্কের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করছেন। এর পাশাপাশি 'অডজব' তো রয়েছেই। অডজবের জন্য সরাসরি কোনো সার্টিফিকেট প্রয়োজন না হলেও ইংরেজি বলতে পারা এবং ইংরেজি জানার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে অনেক বাংলাদেশী ডাক্তার এবং ডেন্টিস্ট নিউইয়র্কে তাদের পেশায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো শহরেই আপনি আসুন না কেন, ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। প্রথম দিকে সামান্য অসুবিধা হলেও পরে কোনো অসুবিধা হয় না। আর নিউইয়র্ক, লসএঞ্জেলেস, শিকাগো, হিউস্টন হলে তো কোনো কথাই নেই। প্রচুর বাঙালি বাংলাদেশীকে আপনি পেয়ে যাবেন যাদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায়।

Shaikh Sirajul Islam
25-81- 34th St. Apt # 3B
Astoria, New York, U.S.A

দঃ কোরিয়া

রুমমেট : আত্মার আত্মীয়

প্রবাসে আপনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, এখানে আপনার আপনজন, মা-বাবা, ভাই-বোন পাশে নেই। তাহলে আপনাকে সেবাযত্ন, দেখাশোনা করবে কে? ভয় নেই, যদি আপনার পাশে থাকে ওদের মতো সহকর্মী বা রুমমেট। হ্যাঁ আমি নিজের কথাই বলছি- আমি এখানে কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম। নিজে কোনো কাজকর্মও করতে পারতাম না। কিন্তু আমার সহকর্মীদের আন্তরিকতার সুবাদে আমি খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠি। আমার রুমমেট দশজন। ওনারা সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরও আমার সমস্ত কাজগুলো করে দিতো। নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে হতো, যখন দেখতাম বন্ধু সোহেল, খলিল, ইকবাল, মনির, রকি ও আওলাদ ভাই, জলিল ভাই এবং সিরাজ আংকেল আমার সেকশনের কাজগুলো ভাগে ভাগে করছে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যখন শ্যামল ও আফজাল আমার জন্য প্লেটে করে খাবার নিয়ে আসে তখন ওদের ভালোবাসা আমাকে আবার নতুন করে শিক্ষা দিল। ওরা সবাই আমাকে এতো ভালোবাসে যা অসুস্থ না হলে হয়তো অনুভব করতে পারতাম না। আমি ওদের কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। ওরা আমার কোনো নিকটাত্মীয়স্বজন নয়। কিন্তু আমি বুঝলাম ওরা আমার 'আত্মার আত্মীয়'। মনে রাখবেন, প্রবাসে আপনার দুঃসময়ে বিপদে আপনার সহকর্মী ও রুমমেট পরম বন্ধু। তাই সহকর্মীকে দূরের লোক না ভেবে আপন করে নিন, দেখবেন সেও আপনার অনেক কাছের মানুষ হয়ে গেছে। প্রভুর কাছে প্রার্থনা আমাদের মতো যেন প্রতিটি প্রবাসী তার রুমমেটকে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে।

শেখ মিন্টু, 4040-220 Inchon Sogo, Soknam-Dong, 223-658 Daesung S.co, South Korea, e-mail : sk_minto@yahoo.com

অ ।স্ট্রে ।লি ।য়া

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী

ব্রাজিল থেকে **সরওয়ার জাহান**

২৯ জানুয়ারি ২০০৪। ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান শিপিং লাইন্সের জাহাজে জয়েন করতে যাব অস্ট্রেলিয়ায়। তিন দিন পরেই কোরবানীর ঈদ। ঈদের আগে এভাবে যাওয়ার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না। কিন্তু ইরান শিপিং লাইন্সের বাংলাদেশের এজেন্ট মালটি মুভ শিপিংয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাজহারুল হক সাহেবের বিশেষ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজি হলাম। জিয়া বিমানবন্দর পর্যন্ত এসে বিদায় দিয়ে গেল আমার স্ত্রী মমতা, মেয়ে ফেমী ও প্রমী, শ্যালক কামাল, ভাগ্নে সোহেল এবং ছোট ভাই সবুজ।

এবার যাত্রা শুরু। আমারও টেনশন শুরু হয়ে গেল। পাসপোর্ট, টিকেট ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সব একবার দেখে নিলাম। বিদেশ ভ্রমণের সময় এয়ারপোর্টের নিয়মকানুন আমার কাছে খুবই ঝামেলা ও বিরক্তিকর মনে হয়। বিশেষ করে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর থেকে। প্রতিটি এয়ারপোর্ট যেন একেকটা দুর্গ। চেকিং আর চেকিং। এসব চেকিংয়ে নিজেকে তখন মনে হয় যেন আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি- কাস্টম, ইমিগ্রেশনের জেরার উত্তর দিতে। কোনো কিছুতে ভুল হওয়া চলবে না। ভুলের যেন কোনো মাফ নেই। তার খেসারত দিতে হবে। তাই বারবার পাসপোর্ট, টিকেট ও অন্যান্য ডকুমেন্ট চেক করে নিচ্ছি, কোনো কিছু বাদ পড়ে গেল কি না। বর্ডিং কার্ড নিয়ে ইমিগ্রেশন পার হয়ে চলে গেলাম সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের সুপরিসর বিমানে। সিটে বসে গেলাম। রাত ১০টা ৫ মিনেটে বিমান উড়লো আকাশে।

বিমানবালাদের আন্তরিক আতিথেয়তায় কেটে গেল ৪ ঘন্টা। ভোর ৪টায় সিঙ্গাপুর পৌঁছে গেলাম। সারা দিন এয়ারপোর্টেই ঘোরাফেরা করে কাটিয়ে দিলাম।

রাতে আবার সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সেই রওনা হলাম অস্ট্রেলিয়ার এডেলাইডের উদ্দেশে। প্লেনের জানালার পাশের সিটে আমি বসা। আমার পাশের দুই সিটে বসেছে চাইনিজ দুই তরুণ-তরুণী। ওদের সঙ্গে কথা হলো। ওরা দু'জনেই অস্ট্রেলিয়ার এডেলাইডে লেখাপড়া করে। ছেলেটা কলেজে এবং মেয়েটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ছুটি কাটাতে গিয়েছিল নিজের দেশ চীনে। প্লেনের যাত্রী সবাই সাদা চামড়ার লোক এবং বেশির ভাগই অস্ট্রেলিয়ান।

সারা রাত প্লেনেই কেটে গেল। সকাল ৮টায় পৌঁছে গেলাম এডেলাইড এয়ারপোর্টে। প্লেন থেকে নেমে সব যাত্রী ইমিগ্রেশনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। আমিও তাদের মধ্যে আছি। এক কাস্টম কর্মকর্তা এলো কুকুর নিয়ে। লাইনে দাঁড়ানো সব যাত্রীর হ্যান্ডব্যাগ যার যার পাশে ফ্লোরে রাখতে বললো, তারপর সিকিউরিটি কুকুর দিয়ে একের পর এক সবার হ্যান্ডব্যাগ চেক করে গেল।

এক সময় সিরিয়ালে চলে এলাম ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার সামনে। আমার চেহারা এবং গায়ের রঙই বলে দিচ্ছে আমি দক্ষিণ এশিয়ার লোক। তার ওপর বাংলাদেশের মতো গরিব এক মুসলিম দেশের লোক। তাই ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার জেরার সম্মুখীন হতে হবে বৈকি। পাসপোর্টটা এগিয়ে দিলাম ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার সামনে। প্রশ্ন করলো কোথায় যাবে? উত্তরে বললাম, পোর্ট লিংকন যাব জাহাজে জয়েন করতে। আবার প্রশ্ন- জাহাজে তোমার র‍্যাঙ্ক কি? বললাম সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার। আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো না। ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গেলাম। পাসপোর্ট হাতে নিয়ে পকেটে রাখলাম। লাগেজ সংগ্রহ করলাম। এবার কাস্টম চেকিংয়ের পালা।

আমার ব্যাগে ব্যবহারের কাপড়-চোপর ছাড়া দুই প্যাকেট মুড়ি এবং দুই কেজি আলাউদ্দিনের মিষ্টি ও সন্দেশ ছিল, যা কাস্টম ডিক্লারেশন ফরমেই উল্লেখ করেছি। গাছের চারা, মাছ, মাংস, ফলমূল, দুধ বা দুধের তৈরি কোনো জিনিস অস্ট্রেলিয়ায় নেয়া নিষেধ, যা এয়ারপোর্টের টিভিতে দেখাচ্ছে।

কাস্টম কর্মকর্তা ডিক্লারেশন ফরম দেখে বললো কি ধরনের খাবার জিনিসি আছে ব্যাগ খুলে দেখাও? ব্যাগ খুললাম। মুড়ি দেখে বললো কিসের তৈরি? বললাম, চাল থেকে তৈরি? মিষ্টি ও সন্দেশ দেখে জিজ্ঞেস করলো কিসের তৈরি? সত্য কথা বলে ফেললাম দুধের তৈরি। দুধের তৈরি জিনিস অস্ট্রেলিয়ায় নেয়া নিষেধ। কাস্টম কর্মকর্তা ভদ্রভাবেই বললো, সরি এগুলো নিতে পারবে না। আমি একটু অনুরোধ করলাম দেয়ার জন্য। সে তখন সিনিয়র কাস্টম কর্মকর্তার কাছে গিয়ে আলাপ করে ফিরে এসে আবারও বললো সরি। শেষ পর্যন্ত মিষ্টি রেখেই লাগেজ নিয়ে বাইরে চলে এলাম। দেখি আমার নাম লেখা প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ভদ্রলোক। তার কাছে গিয়ে পরিচয় দিলাম- আমিই সেই ব্যক্তি যার নাম লিখে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। ভদ্রলোক হেসে বললো, ওয়েলকাম আই অ্যাম মি. বেরি পোলি ফ্রম ইনসকেপ শিপিং সার্ভিস। সে আমাকে রিসিভ করতে এসেছে। আমাকে নিয়ে তার গাড়িতে উঠলো। ভদ্রলোক ড্রাইভ করছে। আমি তার পাশে বসা। সে বললো, তোমার জাহাজ এখনো পোর্ট লিংকন আসেনি। ওয়ালারো পোর্টে আছে। কাজেই তোমাকে এখান থেকে বাসে করে ওয়ালারোতে যেতে হবে।

এডেলাইড এয়াপোর্ট থেকে শহরের সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার পথে ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু সময় কথা হলো। সে আমার সমবয়সী। তার জন্মস্থান গ্রিসে। বর্তমানে সে অস্ট্রেলিয়ার রেসিডেন্ট। সে আমাকে বললো, এ দেশ তো খুবই সুন্দর। তুমিও অস্ট্রেলিয়ার রেসিডেন্সশিপ নিয়ে এ দেশে চলে আস। আমি বললাম, আমি এবং আমার স্ত্রীর কিছুটা অনীহার কারণে চেষ্টা করিনি অস্ট্রেলিয়ার রেসিডেন্সশিপ নিতে। অল্প সময়েই পৌঁছে গেলাম সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে। মি. বেরি পোলি বাসের টিকেট কেটে আমার হাতে দিল। তখন বাজে সকাল ৯টা। আমার বাস ছাড়বে দুপুর ১২টায়। মি. বেরি পোলি বললো, তুমি ইচ্ছে করলে শহরের মার্কেটে

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

ঘোরাফেরা করে সময়মতো বাসস্ট্যান্ডে চলে এসো। আমি ফোনে বলে দিচ্ছি, ওয়ালারো বাসস্ট্যান্ডে লোক থাকবে তোমাকে রিসিভ করতে। আমার অনেক কাজ। আমি বিদায় নেই। গুডবাই দিয়ে চলে গেল মি. বেরি পোলি। সকাল ১১-৩০ মি. পর্যন্ত এডেলাইড শহরের বেশ কিছু অংশ ঘুরে বেড়ালাম। সুন্দর শহর। শনিবার, তাই অফিস আদালত সব বন্ধ। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যাও খুব কম। ফিরে এলাম বাসস্ট্যান্ডে। ১২টা বেজে গেল। বাসে উঠে বসলাম। বাসে তেমন যাত্রী দেখছি না। সময় সোয়া ১২টা বেজে গেলে ড্রাইভার বাস ছেড়ে দিল। এতবড় এসি ভলভো বাসে আমাকেসহ মাত্র ১০ জন যাত্রী নিয়ে বাস রওনা হলো।

রাস্তাঘাট বলতে গেলে ফাঁকাই। বাস শহরের বাণিজ্যিক এলাকা হয়ে এডেলাইড স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে এক সময় শহরের বাইরে বের হয়ে গেল। রাস্তার দু'দিকেই ফাঁকা। কোনো বাড়িঘর নেই। শুধু চাষাবাদের জমি এবং মাঝে মাঝে খামার বাড়ি। এডেলাইড থেকে ওয়ালারো পর্যন্ত ১৬০ কিলোমিটার রাস্তায় ৬ থেকে ৭টা ছোট ছোট শহর পেলাম, যাকে এ দেশে গ্রামই বলা হয়ে থাকে।

বাস যখন ওয়ালারো এসে পৌঁছালো তখন বেলা প্রায় ৩টা বাজে। বাস থেকে নেমে দেখি মধ্যবয়সী এক মহিলা দাঁড়িয়ে, সে আমাকে রিসিভ করলো এবং সরাসরি গিয়ে উঠলাম সনবার্ন লজ মোটেলে। মোটেলের পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ভদ্রলোক আমাকে একটি রুম দিল এবং বললো কি খাবে? আমার পেটে তখন খুব ক্ষিদে। তাই ভদ্রলোককে চিকেন এবং ভাত দিতে বললাম। কারণ ভাত না খেলে মনে হচ্ছিল যেন আমার পেট ভরবে না।

তাড়াতাড়ি গোসল সেরে নিলাম এবং বিছানায় গিয়ে গা'টা একটু এলিয়ে দিলাম। একটু পরই ভদ্রলোক খাবার নিয়ে এসে বললো, হ্যালো মি. জাহান Enjoy with food. এই বলে ভদ্রলোক টেবিলে খাবার রেখে চলে গেল। আমি টেবিলে গিয়ে বসলাম। দেখি প্লেটে অল্প সেদ্ধ মুরগির মাংস, দুই পিস ব্রেড এবং এক চামচ পরিমাণ ভাত। ঝাল ছাড়া খাবার আমার অপ্রিয় হলেও সব খেয়ে ফেললাম, তবুও পেট ভরলো না। খাওয়া শেষে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে বের হলাম হাঁটাহাঁটি করতে। মোটেল থেকে জেনে নিয়েছি এখানে দেখার মতো কি কি আছে এবং সি ম্যান সেন্টার আছে কি না এবং সেটা কোথায় কত দূর। মোটেল থেকে সি ফেরার'স সেন্টার বেশি দূরে নয়। হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে সি ফেরার'স সেন্টারে চলে গেলাম। সি-বিচের পাশে সি ফেরার'স সেন্টার। দরজায় লেখা বিকেল ৬টায় খুলবে। এখন বাজে বিকেল ৪টা। একই বিল্ডিংয়ের অপর প্রান্তে বারান্দায় লোক দেখে এগিয়ে গেলাম। দেখি মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা বারান্দায় বসা। আমাকে দেখে হ্যালো বলে আমার পরিচয় নিয়ে এদের পাশের চেয়ারে বসতে বললো। লোকটির নাম মার্টিন এবং মহিলার নাম ক্যাথি লয়েড। ওরা সি ফেরার'স সেন্টারের কেয়ারটেকার। ওদের সঙ্গে কথা বললাম অনেকক্ষণ। এক ফাঁকে ওদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায়? ক্যাথি বললো- আমার স্বামী-সন্তান ছিল। ডিভোর্স হয়ে গেছে। মার্টিনেরও বউ ছিল, সন্তান ছিল ডিভোর্স হয়ে গেছে। ৯ বছর আগে আমাদের দু'জনার পরিচয় হয়, ভালো লাগে, তখন থেকে আমরা পার্টনার হিসেবে আছি। অর্থাৎ লিভ টুগেদার করছি। আমি বললাম, বিয়ে কর না কেন? ক্যাথি বললো, বিয়ে তো একবারই হয়। আর বিয়ে নয়। পাশে বসা মার্টিন ক্যাথির সব কথার সায় দিয়ে যাচ্ছে।

গল্প করতে করতেই এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এলো এদের বাসায়। ক্যাথি পরিচয় করিয়ে দিল- এডেলাইড থেকে এসেছে ক্যাথির ভাই মাইক লয়েড ও তার স্ত্রী জিল লয়েড। জিল লয়েড দেখতে অন্য রকম অর্থাৎ কালো এবং খাটো, অস্ট্রেলিয়ার লোকদের মতো নয়। আমি ক্যাথিকে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ভাইয়ের স্ত্রী দেখতে কালো এবং খাটো কেন? সে কি অস্ট্রেলিয়ার লোক নয়? ক্যাথি বললো জিললয়েড অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বংশধর। আমার খুব ইচ্ছে হলো আদিবাসীদের গল্প শোনার। ক্যাথিকে বললাম, তোমার মেহমান এসেছে, এদিকে রাতও হয়ে যাচ্ছে। আমি আজ চলে যাই। কাল আবার আসবো এবং তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের গল্প শুনবো। মার্টিন ওর গাড়ি দিয়ে আমাকে মোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল।

পরের দিন বিকেলে আবার ক্যাথির বাসায় গেলাম। দেখি বারান্দায় ওরা সবাই বসে আড্ডা দিচ্ছে এবং সেদ্ধ কাঁকড়া খাচ্ছে। আমাকে বসতে দিল এবং কাঁকড়া খাওয়ার জন্য আহ্বান জানালো। আমি পেটের পীড়ার কথা বলে ওদের কাঁকড়া খাওয়ার আপ্যায়ন গ্রহণ করলাম না। ক্যাথি আমাকে একটি কোক এনে দিল। তারপর কোক খেতে খেতে জিললয়েডের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের অনেক গল্প শুনলাম এবং অনেক তথ্য জানতে পারলাম।

সম্ভবত ২৪ হাজার থেকে ৬০ হাজার বছর আগে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার কেপ ইয়োর্কে আদিবাসীরা (এবোরি জেনিসরা) এসেছিল।

১৭৮৮ সালে ব্রিটিশরা যখন প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় এসে হাজির হয় তখন বিভিন্ন গোত্র এবং ভাষার প্রায় ৭ লাখ আদিবাসী ছিল অস্ট্রেলিয়ায়।

১৮ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ বসতিরা আদিবাসীদের জায়গাজমি সব জোর করে দখল করে নেয়। ১৮২৪ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ বসতিদের অনুমতি দেয় আদিবাসীদের গুলি করে মারার। ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ সরকার মার্শাল 'ল জারি করে আদিবাসীদের দেখামাত্র গুলি করে মারার জন্য। এভাবে ব্রিটিশ বসতিরা এবং ব্রিটিশ সরকার লাখ লাখ আদিবাসী মেরে ফেলে। অসুখ-বিসুখেও অনেক আদিবাসী মারা যায়। এভাবে কমতে কমতে ১৯১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় মাত্র ৩১ হাজারে। ১৯৯৬ সালের শেষ গণনায় দেখা যায়, আদিবাসীদের সংখ্যা বেড়ে ৩,৫২,০০০-এ এসে দাঁড়িয়েছে, যা অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার ১.৯৭ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়ার এক এলাকার আদিবাসীদের সঙ্গে অন্য এলাকার আদিবাসীদের ভাষা ও কালচারে কিছুটা পার্থক্য আছে। প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহু ভাষা আছে। তার মধ্যে বর্তমানে ৬০টির মতো ভাষা প্রচলিত আছে। যেমন- আরাবানা, বুনুবা, ডারাগ, কুক ইয়া-লানজি, জাগেরা, জারু, পাথা, পালাওয়া, কানি, পিটাপিটা ইত্যাদি।

ভাগ্যক্রমে আদিবাসীদের এক অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হলো। সে অনুষ্ঠানে আদিবাসীরা শক্ত এক ধরনের কাঠের সঙ্গে কাঠ ঘষে কিভাবে আগুন জ্বালায় তা দেখালো। লম্বা বাঁশ দিয়ে তৈরি এক ধরনের বাঁশি দিয়ে নানা ধরনের সুর এবং নানা ধরনের শব্দ তৈরি করে দেখালো এবং তার সঙ্গে কয়েক রকমের নৃত্য।

আদিবাসীদের প্রধান হাতিয়ার বুমেরাং কিভাবে মারতে হয় তা দেখালো। প্রথম দিকে বুমেরাং ছেলেরা ব্যবহার করতো জন্তু শিকার করতে এবং মেয়েরা ব্যবহার করতো মাটি গর্ত করার কাজে। বুমেরাং শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বুমেরাং এমন এক হাতিয়ার, যা কোন লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে না পারলেও যেখান থেকে নিক্ষেপ করা হয় সেখানেই আবার ফিরে আসে। আদিবাসীদের অনুষ্ঠানটি আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ার মোট আদিবাসীর (এবোরি জেনিস) ৬০ শতাংশ শহরে বাস করলেও বাকি ৪০ শতাংশ এখনও গ্রামের সেই প্রত্যন্ত এলাকায় আদিযুগের মতোই বসবাস করছে।

মোঃ সরওয়ার জাহান
সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার
ইরান গোলেস্তান, ব্রাজিল

রি ।য়া ।দ

জীবন দেখে নিন, তারপর প্রবাসজীবন

মৃত মানুষের কাফন আগে না করব আগে? যদি কাফন আগে হয় তাহলে নিজের সোনালি দিনগুলোকে আগে উপভোগ করুন, নিজের সুন্দর দেশটাকে ভালোমতো দেখুন, জানুন তারপর প্রবাসী হোন...

জীবনের সূচনা থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে সময়টা লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজেকে ও দেশকে জানা বা দেখা, ক্যাম্পাসে বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আনন্দে মেতে থাকা, ভালোলাগাকে ভালোবাসায় রূপান্তর করা, বইমেলায় ডেটিং করা, বেইলী রোডে আড্ডা মারা, পয়লা বৈশাখসহ দেশের অন্যান্য আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করা, কর্মজীবনে প্রবেশ করা, সুখে সাজানো ছোট্ট সংসারের স্বপ্ন দেখা, সর্বোপরি বিশ্বায়নের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো- এই সময়টাই হলো গোল্ডেন পিরিয়ড অব লাইফ। ছাত্র জীবন পার হতে না হতেই যদি মা, মাটি ও মানুষ ছেড়ে প্রবাসী হই তাহলে ক্ষুদ্র এ জীবনটাতে কি পেলাম? অনেকেই বুঝতে চায় না। আসলে প্রবাস মানেই একঘেয়ে জীবন। এখানে শুধু কাজ আর কাজ। প্রিয় পাঠক, প্রবাসী হওয়ার জন্য আমি কিন্তু কাউকে নিরুৎসাহিত করছি না, শুধু নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছি মাত্র। প্রবাসী হলে বরং পরিবারের লাভ তথা দেশেরই লাভ।

প্রবাসী প্রতিবেশীর গলায় সোনার চেইন আর বড় একটা লাগেজ দেখে পিলে চমকে ওঠে বিদেশ আসার জন্য। যেভাবেই হোক বিদেশ যেতেই হবে। ও...মা... আ...আ... কি চক্‌চক্ করে! কোনো বাধাই শুনতে রাজি নই। কাজেই খুশি মনে স্বাগত জানাতে বাধ্য আমরা প্রবাসীরা। প্লেন থেকে পা নামাতেই যখন ছ্যাঁকা লাগে, তখনই বুঝতে পারে কতখানি পোড়ালে চক্‌চক্ করে! ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই 'মানেনা মন ভেসে যায় দু'নয়ন'। প্রথম প্রথম ডজনে ডজনে চিঠি পাঠাবে কিন্তু উত্তর পাবে দু'চারটা। তারপর ক্রমান্বয়ে সয়ে যাবে সব বিড়ম্বনা, লোপ পাবে আবেগ। কিন্তু মনে থাকবে শুধু বিষয়। 'মা' প্লাস 'অন্য একজন' যাকে নিয়ে হয় খোয়াব। স্বপ্ন মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রয়াস। যার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে যেভাবে খুশি সেভাবে স্বপ্নকে প্রয়োগ করতে পারে নিজের প্রয়োজনে। কিন্তু সেই স্বপ্নের বিষয় যদি ভালোবাসা হয় তাহলে কেমন হতে পারে? আসলে প্রবাসীদের হৃদয়ে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি স্পন্দন সৃষ্টি করে তা হলো একটি অপ্রকাশ্য সুপ্ত অনুভূতি। আর প্রকাশ্যে হলেইবা দোষের কি? সত্যিকার অর্থে সংকল্প থেকে কি প্রবাসীরা আদৌ বেরিয়ে আসতে পারে? তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। স্বপ্ন দেখে সুখী পরিবারের। নানাবিধ স্বপ্নের মাঝেই তো মানুষ, তারপর পৃথিবী ও সমাজ। কিন্তু প্রবাসীদের সব স্বপ্ন কি সার্থক হয়? আমি তো বলবো জীবন থেকে যদি কোনো মূল্যবান জিনিস হারায় তাহলে তার একমাত্র শিকার মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী প্রবাসীরা। অবশ্য ইউরোপের ব্যাপারটা আলাদা। তাদের জীবনে 'Lost' শব্দটির সঙ্গে সাক্ষাৎ খুবই কম। কেননা ইউরোপের কথা শুনলেই (অবস্থা যাই হোক) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু পরমাণু থেকে শুরু করে কীট-পতঙ্গ বা জীব জানোয়ার পর্যন্ত বিস্মিত চোখের সুদৃষ্টি মেলে দেয়। অনিষ্টকারীরা ভুলে যায় অনিষ্টতা, দুষ্টুরা দুষ্টামী, রোগ জীবাণু বা বিষাক্ত ভাইরাস পর্যন্ত রোধ করে তাদের বিস্তার। কাজেই তারা যদি হারুনকে 'সারুন' আর হারিকেনকে 'সারিকেন'ও বলে তাতে কোনো ভুল হবে না। আর যদি পার্টি শব্দটাকে 'পাড়ডি' বলা যায় তাহলে তো কথাই নেই। উপরন্তু মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী কেউ যদি ইঞ্জিনিয়ার বা আরো কিছুও হয় তাহলে তাদের বলা 'নাথিং' শব্দটাকে টিটকারি করে বলবে 'নাশিং' অথবা কানে এমনই শুনবে। সুতরাং বিবাহিত ব্যক্তিরা মোটামুটি সঠিক ঠিকানায় উপনীত হলেও অবিবাহিতরা হয় ছন্নছাড়া। তাও ভরসা নেই কেননা বিবাহিতদের কপালেও কখনো কখনো পোড়া দাগ লেগে যায় মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করার অপরাধে।

অন্যদিকে ছন্নছাড়া বলছি এই অর্থে যে, বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। প্রবাসে এ বন্ধনে বন্দি হবেন? আপনি কি মনে করেন খুব সহজ? গিয়ে দেখবেন আপনি যাকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখে আসছেন, যার প্রেরণায় কষ্টকে মাল্য হিসাবে পরিধান করে প্রতিষ্ঠা লাভের নিমিত্তে কর্মে লিপ্ত হয়েছেন, যার অনুপ্রেরণা আপনাকে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছে, বেকারত্বকে তুড়ি মেরে প্রমাণ করেছেন যে আপনি অকর্মা নন, প্রস্ফুটিত টোলপড়া হাসিটুকুর প্রত্যাশায় বুকে পাথর বেঁধে অপেক্ষা করেছেন বছরের পর বছর, না খেয়ে না পরে পাঠিয়েছেন রেমিট্যান্স, অসহ্য কষ্টের মাঝেও কখনো মৃদু হাসির এতোটুকু বৃথা চেষ্টা করেননি একদিন প্রাণখুলে হাসবেন বলে, কতো ত্যাগ তিতিক্ষায় প্রহর গুনেছেন রাতের পর রাত- অথচ দেখবেন নিষ্ফল আপনার সব সাধনা। চেনা তো দূরের কথা বরং দু'তিন বার নাম বলার পর বাড়ির নাম ও বাবার নাম বললে মুখের আকৃতিতে পরিচয় কিছুটা ফুটে উঠবে। দেখবেন আপনার সামনে দন্ডায়মান ফুলি বেগম আর হৃদয়ের ফ্রেমে রক্ষিত ফুলি এক নয়। বদলে গেছে, হয়েছে ইউরোপ প্রবাসী গাঁয়ের কোনো এক ধনীর গৃহবধূ। সর্বত্র ফুলিভাবী নামেই সমাদৃত। মনে মনে ভাববেন 'ফুলি' কেন 'ভাবী' হল (?), এমন তো কথা ছিল না- আশা তো করেছিলাম আমাকে পাওয়ার জন্য সে হয়তো হয়ে উঠবে ফুলনদেবী। কারণ জানতে চাইবেন? ছোট্ট একটা প্রশ্ন করবেন? চান্স পাবেন না বরং হতে হবে অপমান। তখন ভালোবাসার মনুভাইকে ডাকবে মনুমিয়া। ভুলে গেছে অতীতকে বদলে গেছে রঙ। রঙধনু আকাশে নয়, ফুটে ওঠে মেয়েদের মাঝে নিষ্ঠুর ও কঠিনভাবে। অবশেষে বাবা মায়ের অনুরোধে বাধ্য হয়ে আপনাকে তৃতীয় কোনো স্থানে স্রেফ ফরজ কাজ আদায় করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। খোদার সৃষ্টির সবকিছুই পাবেন কিন্তু একটা ছাড়া, যা কি না আপনার জীবনের সমস্ত কামাই কেন- পৃথিবীর সব সম্পত্তির বিনিময়েও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না, আর তা হল 'প্রশান্তি অব দ্য ফেলে আসা গোল্ডেন লাইফ'। কাজেই আগের সেই বকুলতলা তো আর খুঁজে পাবেন না, বরইতলায় বসে আজম খানের মত গাইতে হবে 'হারিয়ে গেছে খুঁজে পাব না...' সেই সঙ্গে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ গেয়ে উঠবে 'আমও গেল ছালাও গেল চোষ এখন...'। সুতরাং অট্টালিকা বানাতে যদি তার পরিকল্পনা ও ভিত আগে তৈরি করতে হয় অথবা বিন্দু থেকে যদি সিন্ধু হয় তাহলে প্রথমে বিন্দু তৈরি করে পরিবারের সঙ্গে বছর দশেক সকাল বিকাল পানি ঢেলে তৃষ্ণা মিটিয়ে মজবুত করে সিন্ধুর সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমানো উত্তম নয় কি? মানে যা বলছি- মৃত মানুষের কাফন আগে না করব আগে? যদি কাফন আগে হয় তাহলে নিজের সোনালি দিনগুলোকে আগে উপভোগ করুন, নিজের সুন্দর দেশটাকে ভালোমতো দেখুন, জানুন তারপর প্রবাসী হোন। নইলে ক্ষুদ্র জীবনে অবশিষ্ট কিছুই পাবেন না।

আইয়ুব আহমেদ দুলাল
রিয়াদ, সৌদি আরব
E-mail : ayubalibd@hotmail.com

অ । স্ট্রে । লি । য়া

অস্ট্রেলিয়ায় এসে বোকা

মজার আড্ডা চলছিল। বিভিন্ন দেশের ক'জন মেয়ের হাসি-গল্পে মুখর পরিবেশ। এদের মাঝে একজন প্রস্তাব করলো,

-আচ্ছা অস্ট্রেলিয়ায় এসে কে কিভাবে বোকা হয়েছিলাম সে ঘটনা মনে করি চল।

প্রথমেই হাত তুললো জাপানের ইয়োকো। সবাই অবাক হলো। জাপান খুব উন্নত দেশ। জাপান থেকে এসে কেউ বোকা হতে পারে ভাবা যায় না। ইন্দোনেশিয়ার নান্নী হেসে বলে উঠলো,

- কিসে অস্ট্রেলিয়া জাপানের চেয়ে উন্নত যে তুমি পর্যন্ত বোকা হয়েছিলে?

- ঠিক উল্টো। অস্ট্রেলিয়ার কারিগরি জাপানের চেয়ে পিছিয়ে আছে বলেই আমি বোকার মতো বিপদে পড়েছিলাম।

- কিভাবে?

সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করলো। ইয়োকোর গল্প শোনার জন্য সব চেহারায় অধীর আগ্রহ।

- মেলবোর্নে আসার পরদিন সিটি সেন্টার থেকে মেন্টনে যাব বলে ট্রেনে উঠেছি। মেন্টন স্টেশনে ট্রেন থামলো, নামবো বলে দরজার কাছে উঠে এলাম। দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই, দরজা খুললো না। আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো। নতুন দেশ, ভাষাটাও অতো ভালো রপ্ত হয়নি। ভাগ্যিস মোবাইল ফোন সঙ্গে ছিল। টোকিওতে এক বন্ধুকে ফোন করলাম, যে অস্ট্রেলিয়া ঘুরে গিয়েছিল। ফোন পেয়ে সে তো প্রথমে হেসে আকুল। তারপর বললো, 'এটা কি জাপান পেয়েছো, সবকিছু অটোমেটিক!' ওর কথা মতো পরের স্টেশনে টেনে দরজা খুলে ট্রেন থেকে নামলাম। উল্টো দিকের স্ট্রেনে উঠে মেন্টনে ফিরলাম।

সবাই হো হো করে হাসলো। নান্নী বলে উঠলো,

- কি করে ট্রেন থেকে নামবে তা জানার জন্য মেলবোর্ন থেকে টোকিওতে ফোন! টেকনোলজিকে পকেটে নিয়ে ঘোরে জাপানিরা।

ভারতের শান্তি শর্মা তখন বললো,

- একইভাবে ট্রেন আমাকেও বোকা বানিয়েছে।

- কেন ভারতেও কি ট্রেনের দরজা আপনাআপনি খোলে?

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ফোড়ন কাটলো নান্নী। ওর দিকে তাকিয়ে কপট রাগের ভঙ্গিতে শান্তি উত্তর দিল,

- না রে ভাই না। তবে এখানে আসার আগে দু'বছর আমি লন্ডনে ছিলাম। আর ওখানে তো তখন টিউব স্টেশনে ট্রেন ঢোকার সময় ঘোষণা শুরু হতো। 'Mind the door please!' এই ঘোষণা কেন করে বুঝিনি। এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করার পর জানলাম ট্রেনের দরজা অটোমেটিক্যালি খুলে যায় বলে যাত্রীদের সতর্ক করা হয়। যা হোক, অস্ট্রেলিয়ায় আমি অবশ্য ইয়োকোর মতো ট্রেনের ভেতরে আটকা পড়িনি। ট্রেন থামলো তবে দরজাও খুললো না, কেউ নামলোও না। আমার ট্রেনে ওঠা হলো না।

নান্নীর গলা আবার শোনা গেল,

- আর তোমার নিশ্চয় মোবাইল ফোন ছিল না, তাই না?

- ঠিকই ধরেছ, তবে বুদ্ধি ছিল। অপেক্ষায় রইলাম, পরের ট্রেন থামলে যে দরজা দিয়ে যাত্রীরা নামলো ওই দরজা দিয়ে উঠে গেলাম।

এবার ইংল্যান্ডের লিন্ডা বললো তার গচ্ছা দেয়ার ঘটনা। লিন্ডার অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেল কিভাবে বেচারী পুলিশকে জরিমানা দিয়েছে, ব্যাংকে রাখা তার টাকা খোয়া গেছে।

- নতুন দেশের নিয়মকানুন জানা না থাকলে কি যে বিপদ হয় সে ঘটনা শোন। তোমরা না হয় সময় মতো ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারনি, আর তো কিছু হয়নি। আমি পরিবার-পরিজন নিয়ে চেনাজানা একজনের বাড়িতে Sublet নিয়ে উঠি প্রথমে। ছুটির দিনে এক বন্ধু তার গাড়ি ধার দিল আমাদের শপিংয়ের সুবিধার জন্য। আমার স্বামী গাড়ি চালাচ্ছিল, আমি বাচ্চা কোলে পাশের সিটে বসা। শপিং সেন্টারের কাছে যেই পৌঁছেছি, পুলিশ গাড়ি থামালো। কোনো কিছু ভুল করিনি, স্পিড ঠিক ছিল, সিটবেল্টও বাধা, তবুও কেন পুলিশ আসছে বুঝতে পারিনি।

- তারপর পুলিশ কি বললো বল!

সবার মাঝে নান্নীর কৌতূহল সবচেয়ে বেশি। সে প্রশ্ন না করে থাকতে পারলো না।

- বাচ্চাটা কোলে ছিল, ওটাই হলো অপরাধ। অস্ট্রেলিয়ায় গাড়িতে বাচ্চা কোলে নিয়ে বসা যাবে না। ইংল্যান্ডে ওই নিয়ম ছিল না। তাই আমরা যে নিয়ম ভাঙছি বুঝতে পারিনি। যতো কিছুই বলি না কেন, পুলিশের এক কথা Ignorance of law is no excuse. জরিমানা মেনে নিতে হলো।

লিন্ডার কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো না। শান্তা সাবধানী গলায় বললো,

- এবার নতুন কোনো দেশে যেতে হলে ট্রাফিক ল' ভালোভাবে জেনে যাব।

লিন্ডা কথা কেড়ে নিয়ে বললো

- শুধু ট্রাফিক ল' জানলেই ক্ষতি এড়াতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আরেক আক্কেল সেলামি দেয়ার ঘটনা শোন তাহলে। আমার একটা অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উঠানোর পর ১০০ ডলার জমা ছিল। মাস ৬ পর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে টাকা তুললাম। অবাক হয়ে দেখি আমাকে ৭০ ডলার মাত্র দিল।

- টাকা কম দিল কেন?

সবাই একসঙ্গে জানতে চাইল। লিন্ডা এবার তার স্বভাবজাত শান্ত ভঙ্গিতে বললো,

-আমিও অবাক হয়েছি টাকা কম দেখে। জানতে চাওয়ার পর কারণ বললো যে, ৫০০ টাকার কম কোনো অ্যাকাউন্টে থাকলে ওরা অ্যাকাউন্ট কিপিং ফি রাখে। প্রতি মাসে ৫ ডলার করে ফি কেটে রেখেছে।

লিন্ডার কথা শেষ হবার পর সবাই চুপচাপ। মনে হলো সবাই যেন ভাবছে যে তারা বড় বাঁচা বেঁচেছে। তাদের সামান্য কারণে জরিমানা দিতে হয়নি, ব্যাংকও ফি কেটে রাখেনি।

দিলরুবা শাহানা
অস্ট্রেলিয়া